হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দুধর্মের স্বরূপকে অনুধাবন করার জন্য তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথমেই যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল হিন্দুধর্মের মর্মবাণীটি উপলব্ধি করা যার মধ্যে বেদ এবং গীতার এক অপূর্ব সমন্বয়ধর্মিতা প্রতিফলিত হয়। বেদের গায়ত্রীমন্ত্র এবং গীতার শিক্ষা--উভয়ের একত্রিত রূপের মাধ্যমেই হিন্দুধর্মকে উপলব্ধি করা যায়।

হিন্দুধর্ম একইসঙ্গে তত্ত্ব ও সাধনার সমন্বয়। এখানে শুধু তত্ত্ব আলোচনা হয়নি, তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা তার উপলব্ধি সম্ভব। হিন্দুধর্মে যে ঈশ্বরকে সর্বপরিব্যাপ্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, তাকে প্রত্যক্ষানুভূতিতেই জানা সম্ভব এবং তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা।

'ধৃ' ধাতু মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম কথাটির উৎপত্তি। 'ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ' এই হিসেবে যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে তাই ধর্ম। আরও ব্যাপকভাবে বলতে হয় যা বিশ্বজগতকে ধারণ করে তাই ধর্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের কর্তব্যসাধনকেই ধর্ম বলা হয়েছে। মনুসংহিতা এবং গীতাতেও ধর্ম বলতে কর্তব্যকর্মকেই বোঝানো হয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,'আচারা পরমো ধর্মঃ'। মেধাতিথিও ধর্মকে কর্তব্যকর্ম হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। মহাভারতেও সদাচরণকেই ধর্ম বলা হয়েছে। বেদ এই ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলে ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে। অর্থাৎ ধর্ম হল একটি সামাজিক আদর্শ। সমাজের পটভূমিতেই ধর্মাচরণ পরিণতি লাভ করে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যই ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম হল সামাজিক ও নৈতিক বিধি। যাকে ন্যায়ধর্ম বা justice বলা হয় ভারতীয় হিন্দুধর্মে তাকেই ধর্ম বলা হয়।

সেই অনুযায়ী ধর্ম দু'প্রকারের--সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। সামান্য বা সাধারণ ধর্ম বলতে বোঝায় যে ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম সমগ্র মানব সমাজের আচরণীয় অর্থাৎ বর্ণ আশ্রম নির্বিশেষে শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার জন্য যে কর্তব্য কর্মগুলি আমাদের অবশ্যপালনীয় সেগুলিই হল সামান্য বা সাধারণ ধর্ম। মানব সমাজের অস্তিত্ব ও ভারাবাহিকতাকে সুরক্ষিত করার জন্য যে কর্তব্য কর্মগুলি আমাদের আচরণীয় সেগুলিকেই সামান্য ধর্ম বলে। স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু তাঁর মনুসংহিতা গ্রন্থে এইরূপ দশটি আচরণীয় কর্তব্য কর্মের কথা বলেছেন। সেগুলি হল, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। নিজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অপরাধ মার্জনা, সহনশীলতা, অপরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করা, দেহ-মনের শুচিতা, ইন্দ্রয়সংযম, বিচারবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, বিশ্বের যে নৈতিক শৃঙ্খলারূপী ঋত তাকে জানা ও আমাদের শত্রুরূপী ক্রোধশূন্যতা--এই গুণধর্মগুলি সকলের থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলিকেই মনু প্রত্যেক মানুষের মৌলিক কর্তব্য বলে মনে করেন।

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন মানুষের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী যে আচরণীয় কর্তব্য-কর্মগুলি তাদের বিশেষ ধর্ম বলে। এগুলিকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে। তবে হিন্দুধর্মে বর্ণ বলতে রঙকে না বুঝিয়ে মানসিক প্রণতাকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র--এই সকল শ্রেণীর মানুষের যে কর্তব্য-কর্মগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলি হল বর্ণধর্ম। আবার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী মানুষের যে কর্তব্য-কর্মগুলি নির্ধারিত হয়েছে সেগুলিকে আশ্রমধর্ম বলে। এগুলি হল--ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রম।

হিন্দুধর্ম অনুযায়ী যদি কারো ধর্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বেদ, স্মৃতি, সদাচরণ ইত্যাদির উপরেই নির্ভর করতে বলা হয়েছে। কেননা এগুলিকে মনুস্মৃতিতে ধর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে--

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ
স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধম্ প্রাহুঃ
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষনম্।।

হিন্দুধর্মে মানুষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ ধর্মের দুটি পথ হল--প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। হিন্দুধর্মে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে উপেক্ষা না করে ভোগী জীবনের গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত তেমনই ত্যাগী জীবনের গুরুত্বও স্বীকৃত। হিন্দধর্মে যে চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয় তার মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের দ্বারা অভ্যুদয় লাভ হয় এবং মোক্ষের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। হিন্দুধর্মে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষই হল চরম লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য লাভের জন্য হিন্দুধর্মে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে বলে হিন্দুধর্মকে যতটা না ধর্ম মনে করা হয় তার চেয়ে বেশী দর্শন মনে করা হয়। প্রথমে গুরুবাক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতে হবে, তারপরে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির আলোকে তাকে গ্রহণ করতে হবে, সবশেষে নিরন্তর ধ্যানের সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হল তার সত্যতাকে হৃদয়ে ধারণ করে সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্ত, বাক্য ও কর্মকে পরিচালিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

ভারতীয় হিন্দুধর্মে জ্ঞান ও কর্মের এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। গীতার একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায়--'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি'।।
অর্থাৎ ধর্ম কি আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার কোন প্রবৃত্তি নেই। আবার অধর্ম কি আমি জানি, কিন্তু তা থেকেও আমি নিবৃত্ত থাকি না। এখানে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান অনুযায়ী যদি কর্ম না করা হয় তবে সেই জ্ঞান নিস্ফল হতে বাধ্য। হিন্দুধর্মে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে বলেই তা একাধারে ধর্ম ও দর্শন। সেজন্যই পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে

Scanned with CamScanner

ভারতীয় হিন্দুধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

উপসংহার- ভারতীয় হিন্দুধর্ম যদিও পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ শ্রেণীর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও তাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ভারতীয় হিন্দুধর্মকে বৈচিত্র্য দান করেছে। হিন্দুধর্ম একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী, পৌত্তলিকতাবাদী পাশাপাশি প্রাণবাদে বিশ্বাস, যাদু-তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়গুলিও ভারতীয় হিন্দুধর্মকে বৈচিত্র্য দান করার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

Scanned with CamScanner